সভ্যতার উন্মেষ ও বিকাশে নদীর ভূমিকা — বঙ্গভূমির প্রেক্ষিতে

ড. রেবতী মোহন সরকার

মানব সংস্কৃতি ও সভ্যতার উন্মেষ এবং ক্রমবিকাশের সঙ্গে নদী প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত। পৃথিবী সৃষ্টির প্রাথমিক পর্যায়েই নদীসমূহের উৎপত্তি ঘটেছিল। পরবর্তী পর্যায়ে এই রেশ ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে প্রাকৃতিক কার্য-কারণের ফলেই একসময় অবিশ্রান্ত বৃষ্টিপাতের সূচনা হয়েছিল যার কোনও সীমা-পরিসীমা ছিল না। সেই সময়ে তৈরি হয়েছিল নানা ধরনের প্রাকৃতিক জলাশয়। আবার উচ্চভূমিতে পতিত জলরাশি প্রাকৃতিক কারণেই নিম্নাভিমুখী হয়েছিল। ক্রমাগত বৃষ্টিপাত মাটির বুকে জলধারা সৃষ্টি করে হয়েছে নদী এবং মাধ্যাকর্ষণের প্রভাবে সেই নদীর জল মাটির বুকে গহ্বর কেটে কেটে এগিয়ে চলে. মাটির প্রকৃতি অনুযায়ী সেই গহ্বরের বিভিন্ন ধরণ হয়ে থাকে এবং নদীর আকার ও প্রকৃতি তারই উপর বহুলাংশে নির্ভরশীল। সাধারণতঃ নদীকে তার প্রকৃতি অনুযায়ী চারভাগে ভাগ করা হয় — (১) দীর্ঘজীবী অথবা চিরস্থায়ী নদী, (২) অস্থায়ী অথবা মরসুমী নদী, (৩) সবিরাম নদী এবং (৪) ক্ষণস্থায়ী নদী। নদীর ভূতাত্ত্বিক কর্মপদ্ধতিকে ত্রি-পর্যায়িক রূপে চিহ্নিত করা হয়। এগুলি হল ক্ষয়, বহন এবং অবক্ষেপণ। নদীর ভূমি গঠনের দুটি রূপ বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য — যেমন, (১) ক্ষয়জাত ভূমিরূপ এবং (২) অবক্ষেপণজাত ভূমিরূপ। প্রথমটি হল মৃত্তিকা স্তরের নিম্নভাগে কঠিন শিলাময় স্তর কর্তন করে সৃষ্টি হওয়া ভূমিরূপ। এর ফলে বিভিন্ন ধরনের নদী উপত্যকা যেমন গিরিখাত, গভীর খাত ইত্যাদি, ঘটাকার গর্ত বা মন্থকূপ, নদীপ্রপাত এবং জলপ্রপাত, নদীসোপান, বিসর্প পথ ইত্যাদি সৃষ্টি হয়েছে। দ্বিতীয়টির ক্ষেত্রে দেখা যায় যে বিভিন্ন ধরনের ক্ষয়িত উপকরণের অবক্ষেপণ পদ্ধতির মাধ্যমে সৃষ্ট হয়েছে অবক্ষেপিত ভূমিরূপ যেমন পলিজ ভূমিভাগ, শঙ্কুব্যভূমি, প্রাকৃতিক নদীবাঁধ (Leaeves), প্লাবন সমভূমি, সোপনা ভূমি (Terraced Land), বদ্বীপ ইত্যাদি।

ক্ষয়করণ নদীর অন্যতম প্রধান কাজ। ইংরাজী erosion কথাটি এসেছে ল্যাটিন শব্দ erodere থেকে — যার অর্থ হল অবক্ষতি। নদীর ক্ষয়করণ কার্যের গতি-প্রকৃতি যে সকল প্রাকৃতিক ঘটনাবলীর উপর নির্ভর করে তা হল — প্রণালী ঢাল বা নতি, জলের পরিমাণ এবং বেগ ও গতিসঞ্জাত, জল অপসারণ, পলির বোঝা ইত্যাদি। এই পলির বোঝার মধ্যে রয়েছে নুড়ি, বালি, কাদা-মাটি-পাঁক ইত্যাদি। এই প্রসঙ্গে লক্ষ্যণীয় যে নদীর ক্ষয়করণ দু'ভাবে ঘটে — প্রথমটি হল রাসায়নিক ক্ষয়করণ এবং অপরটির নাম যান্ত্রিক ক্ষয়করণ। এই ক্ষয়করণের কাজটিই হল নদীর বিভিন্ন ধরনের ভূমিরূপ দানের

প্রাথমিক এবং সুদৃঢ় ভিত্তি। একেবারে প্রারম্ভিক পর্যায়ে মানব সংস্কৃতির আবির্ভাব ঘটেছিল এই সকল নদীজ ভূমিরূপের অঙ্গণে। আদিম মানুষ, এই ধরনের ভূমিভাগকে কেন্দ্র করে অথবা ঐরকম ভূমিভাষার নিকটবর্তী অঞ্চলে বসতি স্থাপন করেছিল যদিও প্রাথমিক পর্যায়ে সেই সকল বসতি ক্ষণস্থায়ী ছিল। ভূমিরূপের বিভিন্ন পর্যায়ে মানব সংস্কৃতি / সভ্যতার বিকাশের আলোচনা ও মূল্যায়ণের প্রেক্ষিতে এই ভূতাত্ত্বিক ঘটনাবলীর বিষয়ে সাফল্য আলোকপাত আবশ্যিক বলেই বিবেচিত হয়। কারণ সংস্কৃতি / সভ্যতা শূন্যস্থানে বিকশিত হয়নি বা হতে পারে না. এর জন্য প্রয়োজন অনুকূল পরিবেশ। নদীর নানারূপ কার্যাবলীর বিভিন্ন ধরনের অনুকূল পরিবেশ রচনা করেছিল। এদের মধ্যে প্রথম উল্লেখনীয় বিষয় হল নদী উপত্যকা। নদীকর্তৃক ক্ষয়করণের ধারা ও প্রকৃতি ইংরাজী V অক্ষরের আকারে এই নদী উপত্যকা গঠিত হয়। কারণ প্রথম দিকে নদীর তীব্র স্রোত নিম্নভাগের মাটি কেটে এগিয়ে চলে। কিছুদূর গমনের পর অর্থাৎ পরবর্তী ক্ষয়করণে নদীর দু'পাশের পাড় প্রশস্ততা লাভ করে। তারপর নদী যত সম্মুখভাগে অগ্রসর হয় এই উপত্যকার আকৃতির ততই পরিবর্তত হতে থাকে। উপত্যকা ভূমি প্রশস্ততা লাভ করে — এর নিম্ন ভূমিভাগটি সমতল ও চওড়া হতে থাকে। V আকৃতির উপত্যকার দুটি বিভাগ রয়েছে। এদের একটি হল গিরিখাত (Gorge) এবং অপরটি গিরি সঙ্কট (canyan)। প্রথম ক্ষেত্রে নদী গভীর খাত সৃষ্টি করে এবং তার দুটি বহির্পাশ অর্থাৎ দুটি দেওয়াল বা পাড় অত্যন্ত খাড়াভাবে বিরাজ করে। আবার এই খাতটি যখন আরও গভীর ও বিশাল আকার ধারণ করে এবং বিস্তৃত এলাকা জুড়ে বিরাজ করে তখন তাকে গিরিসঙ্কট নামে অভিহিত করা হয়। হিমালয়ের নদীসমূহে এই ধরনের গিরিখাত দেখা যায়। এছাড়া ছোটনাগপুর অঞ্চলের পাহাড়ী নদীগুলি বিভিন্ন ধরনের গিরিখাত সৃষ্টি করেছে। নদী তার গতিপথে আরও একটি বিশিষ্ট পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটিয়েছে। এটি হল জলপ্রপাত। বিভিন্ন ধরনের ভূ-প্রাকৃতিক কারণে নদীর স্রোতধারা যখন হঠাৎ উপর থেকে নিচে পড়ে তখনই তাকে বলা হয় জলপ্রপাত। নদী উপত্যকার নিম্নভাগে সৃষ্টি হয় নদীবেদিকা বা River Terrace। এগুলি বহুসময় ধাপের মতো দেখতে হয় এবং ধাপগুলি বেশ প্রশস্ত। সমভূমিতে প্রবহমান নদীগুলির এই ধরনের বেদিকা বিশেষভাবে গঠিত হতে দেখা যায়। নদীর গতির অন্তিম পর্যায়ে খুব স্বাভাবিকভাবেই তার গতিবেগ শ্লথ হয়ে পড়ে। জলস্রোতের তোড় কমে যায় এবং এর ফলে তার সম্মুখে বিভিন্ন ধরনের বাধা-বিপত্তিতে নদীর গতি স্তিমিত হয়ে পড়ে। এই পর্যায়েই সৃষ্টি হয় নদীর আঁকা-বাঁকা পথ যার নাম বিসর্প বা Meander। নদীগুলিতে তিন ধরনের বিসর্প দেখা যায় — (১) খেলানো বিসর্প, (২) অশ্বক্ষুরাকৃতি বিসর্প এবং (৩) হাঁসুলি বাঁক বিসর্প। নদীর অন্তিম গতিতে তার আর বিশেষ বহন ক্ষমতা থাকে না, ফলে অবক্ষেপণজনিত ভূমিরূপের সৃষ্টি হয়। এই পর্যায়ের ভূমিরূপগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল পলিজ প্রস্তর এবং শঙ্কুবৎ ভূমি, বালুকাময় বাঁধ ও প্রাকৃতিক বাঁধ, প্লাবন ভূমি এবং বদ্বীপ। নদীর শেষ পর্যায়ের জীবনে সৃষ্ট এই সকল ভূমিরূপগুলি

মানবজীবন পরিচালনে বিশেষভাবে অনুকূল পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছিল। তবে ব-দ্বীপ গঠনটিই বুঝি মানবজীবনের পরিপ্রেক্ষিতে নদীর বিশিষ্ট অবদান। ব-দ্বীপের ইংরাজী প্রতিশব্দ হল Delta — একটি গ্রীক অভিধা। আফ্রিকার নীলনদের মুখে বহুবিস্তৃত ত্রিকোণাকার অবক্ষেপণ লক্ষ্য করে প্রখ্যাত গ্রীক ঐতিহাসিক হেরোডোটাস একে Delta নামে অভিহিত করেন। ভারতের বিভিন্ন নদী যেমন গঙ্গা, মহানদী, গোদাবরী, কৃষ্ণা, কাবেরীতে ব-দ্বীপ উল্লেখযোগ্য। তবে গঙ্গার মোহনায় যে ব-দ্বীপ রয়েছে তা আকৃতি এবং প্রকৃতিতে অতীব গুরুত্বপূর্ণ। পৃথিবীর মধ্যে বৃহদাকার ব-দ্বীপ হিসেবে এই গঙ্গা ব-দ্বীপ মানব সভ্যতার উল্লেখ এবং বিস্তারে কার্যকরী প্রভাব উপস্থাপন করেছে।

নদী সম্পর্কে এত বক্তব্য উপস্থাপনের একমাত্র উদ্দেশ্য হল যে মানুষের জীবনে সাংস্কৃতিক পর্যায়টির সূত্রপাত ঘটেছিল নদীতীরবর্তী অঞ্চলসমূহে। সুদূর প্রাগৈতিহাসিক যুগে প্লাইস্টোসিন ভূতাত্ত্বিক পর্যায়ের সূচনায় মানবেতর প্রাণিরা মানুষ হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছিল। এই মানবরূপী প্রাণিরা এই সময়েই কোনও একদিন পাথরের উপর পাথরের ঘা দিয়ে পৃথিবীর প্রথম হাতিয়ার তৈরি করেছিল। সংস্কৃতি বিজ্ঞানের মতে এই হাতিয়ার নির্মাণ প্রচেষ্টাটাই তাকে মানব পর্যায়ে উন্নীত করেছিল। হাতিয়ার তৈরি কাজটির সার্বিক ফল হল সংস্কৃতির উন্মেষ। নৃবিজ্ঞানের মতে কোনও প্রাণি যখন বিশেষ ধরনের কর্মকাণ্ডে নিজেকে নিবদ্ধ করে এবং সেই কর্মধারা পরিবর্তনমুখী হয় অর্থাৎ কর্মধারা একস্থানে স্থির হয়ে থাকে না তখনই সেই কর্মকাণ্ডের যোগফলকে বলা হয় সংস্কৃতি। সভ্যতা হল সংস্কৃতি একটি বিকশিত পর্যায় বিশেষ। অগ্রসর সমাজব্যবস্থায় এই পর্যায়টি নাগরিক সমাজ সংগঠন দ্বারা রূপায়িত। সভ্যতাকে সংস্কৃতির অধিকতর জটিল ও বিবর্তিত রূপ হিসেবে ধরা হয়। সংস্কৃতির ঊষাকাল হল প্রত্নপ্রস্তর যুগ। এই প্রস্তর যুগই মানবেতর প্রাণিগোষ্ঠী এবং মানবের মধ্যে একটি সীমানা নির্ধারণ করেছে। যে সকল প্রাণি এই বিশেষ সীমারেখা অতিক্রম করেছে তারাই পৃথিবীতে মনুষ্য পদবাচ্য হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। এখান থেকেই শুরু হয়েছে মানুষের বিজয় যাত্রা। মানুষ প্রাণিজগতের অন্যতম সদস্য হয়েও সে একইভাবে পড়ে থাকেনি। দিনের পর দিন যে নতুন ও অভিনব উদ্ভাবনে ব্রতী হয়েছে এবং ফল মিলেছে হাতে হাতেই। পৃথিবীর বহু ঘটনাবলীকে সে অচিরেই বিশ্লেষণ করে তাদের রহস্য উদ্‌ঘাটনে পারদর্শী হয়েছে। এই প্রয়াসটিই হল সংস্কৃতির মূলবস্তু। একটি প্রস্তরখণ্ডকে নিয়ন্ত্রিত আঘাতদানের মাধ্যমে সেটিকে সূচালো এবং ধারালো করে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করার উদ্ভাবনী শক্তি সেদিনের কতকগুলি মানুষরূপী প্রাণিকে বিশিষ্টতা দান করেছিল। এই বিশেষ উদ্ভাবনী প্রয়াসটি সুদূর প্রসারী হয়ে পড়ল এবং ঐ প্রাণিরা পুরুষানুক্রমে এই ধরনের হাতিয়ার তৈরির মাধ্যমে প্রতিকূল পরিবেশ-পরিস্থিতির সঙ্গে সংগ্রামে জয়ী হল। এই জয় সংস্কৃতিরই নয় — যে সংস্কৃতি মানব সভ্যতা আগমনের বহুপূর্বেই বিকশিত হয়েছিল।

সংস্কৃতির বিকাশের সঙ্গে নদীসমূহের সংযোগ অবিচ্ছিন্ন। নদীর জলরাশির ক্রমাগত

ক্রিয়ার ফলে যে সকল উপলখণ্ড গোলাকার ধারণ করে নদীবক্ষে ছড়িয়ে পড়েছিল সেগুলি সংগ্রহ করে আদিম মানুষ প্রাথমিক আঘাতদানের মাধ্যমে এদের একদিক সূচালো করে অথবা চওড়া ধারালো অংশ নির্মাণ করে শিকার ও সংগ্রহ ভিত্তিক কর্মধারাকে বহুলাংশে নিশ্চয়তা দান করেছিল। প্রস্তর যুগের সূচনা পর্বে সেদিনের আদিম মানুষ নদীতীরের দু'পাশে নিজেদের কর্মধারাকে সীমায়িত করেছিল। কাজেই এই সময় নদীতীরবর্তী সংস্কৃতি গড়ে উঠে — যে সংস্কৃতি নদীপ্রবাহের সঙ্গে তাল মিলিয়ে অগ্রসর হতে থাকে। এই কারণে এই সাংস্কৃতিক পর্যায়টিকে বলা হয় নদী সম্প্রবাহ সংস্কৃতি বা River Drift Culture। আদিমতম মানব গোষ্ঠীর বিভিন্ন জীবাশ্ম আবিষ্কৃত হয়েছে পৃথিবীর নানা দেশের নদীর তীরভূমিতে। এশিয়া মহাদেশের প্রাচীনতম মানুষটির জীবাশ্ম আবিষ্কৃত হয় নবদ্বীপের সোলো নদীর তীরে। এর পূর্বে আবিষ্কৃত হয়েছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নিয়ানতারডাল মানুষ। একে পাওয়া যায় জার্মানীর নিয়ানতার নদীর উপত্যকাভূমিতে। আফ্রিকাকে বর্তমানে আদিম মানুষের উৎসভূমি হিসেবে বর্ণনা করা হয়। বিভিন্ন ধরনের ক্ষেত্রগবেষণা এবং বিশ্লেষণের মাধ্যমে দেখা গিয়েছে যে আফ্রিকার মাটিতেই সর্বপ্রথম মানবেতর প্রাণিরা মানবে রূপান্তরিত হয়। বিভিন্ন ধরনের টোমিনিড অর্থাৎ মানবরূপী প্রাণিগোষ্ঠীর জীবাশ্ম এখানের বিখ্যাত ওমো হাদার, আওয়াস নদীতীরভূমিতে আবিষ্কৃত হয়েছে। ভারতে যে একটি বিশেষ আদিমতম মানুষের জীবাশ্ম মিলেছে সেটিও নর্মদা নদীর উপত্যকাভূমি আবিষ্কৃত হয়েছে। নদীর তীরভূমিগুলিতে সেদিনের আদিম মানবগোষ্ঠী তাদের জীবনধারাকে বিকশিত করেছিল। এই কারণেই পৃথিবীর বিশেষ করে পুরাতন পৃথিবীর (Old Wold) নদীর তীরভূমিতে বিভিন্ন পর্যায়ের এবং বিভিন্নরূপী প্রস্তর হাতিয়ার দেখতে পাওয়া যায়। পৃথিবীর প্রাচীনতম সাংস্কৃতিক পর্যায়গুলির বিকাশে তাই নদীগুলির অবদান অতুলনীয়। অবিভক্ত ভারতের প্রাচীনতম সাংস্কৃতিক নিদর্শন অর্থাৎ নিম্নপ্রত্নপ্রস্তর যুগের হাতিয়ার পাওয়া গিয়েছিল পাঞ্জাবের সোহন নদীর অববাহিকায়। সোহন সিন্ধুর একটি উপনদী। এই সিন্ধু নদীর তীরেই পৃথিবীর প্রাচীনতম সভ্যতাগুলির অন্যতম সিন্ধুসভ্যতা বিকাশলাভ করেছিল।

নদীকে কোনও কৃত্রিম সীমারেখায় আটকে রাখা যায় না। কোনও রাজনৈতিক বা প্রশাসনিক পরিমণ্ডলের মাধ্যমে চিহ্নিত অংশের মধ্যে নদী সীমাবদ্ধ নয়। একটি দীর্ঘতম নদী বহু দেশ ও বহু জনপদ অতিক্রম করে প্রবাহিত হয়। কাজেই নদীর পরিচয় সর্বজনীনতার বন্ধনে আবদ্ধ। তবে নদী যখন এক একটি অঞ্চল বা বিশেষ জনপদের মধ্যে প্রবাহিত হয় তখন স্থানীয়ভাবে তাকে সেই স্থানের নদী বলেই চিহ্নিত করার মানসিকতা গড়ে উঠে। স্থানীয় সামাজিক-সাংস্কৃতিক জীবনের সঙ্গে তখন নদীর ঐ অংশটুকুই বিশেষভাবে জড়িত হয়ে পড়ে। তাকে নিয়ে রচিত হয় নানা গল্প-গাথা — অনুষ্ঠিত হয় বহু উৎসব-পার্বণ। তবে এর সঙ্গে নদীর ভৌগোলিক এবং ভূতাত্ত্বিক পশ্চাৎপট ভিন্নতা প্রদর্শন করে কারণ এই প্রেক্ষাপটটি অবিচ্ছিন্ন. নদীর ভৌত গতি-প্রকৃতি বিশ্লেষণে এই সমগ্র রূপটিরই অনুধাবন

কাম্য। তাহলেও প্রায়োগিক জীবনে দেখা যায় যে বিশাল দৈর্ঘ্য সমন্বিত এবং পাহাড়-পর্বত, মালভূমি, সমভূমি, নিম্নভূমি অধ্যুষিত নদীকে রাজ্য, জেলা এমনকি গ্রামীণ পরিমণ্ডলের পশ্চাৎপটে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। বিভিন্ন জনপদের মধ্যে প্রবাহিত এই নদীর ধারাকে নানা নামে পরিচিত হতেও দেখা যায়। এই পরিচয় আরোপণ নদীর ভৌগোলিক-ভূ-তাত্ত্বিক পরিস্থিতিকে অতিক্রম করে সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে গভীরভাবে পরিশীলিত হয়েছে। এই বিশেষ ধরনের মানসিকতা নদীর সঙ্গে জনজীবনকে ওতপ্রোতভাবে বেঁধে রেখেছে।

একথা অনস্বীকার্য যে বাঙলা বা পশ্চিমবঙ্গের একটি স্বতন্ত্র নদী হিসেবে কোনও একটি বিশিষ্ট ও পূর্ণ বিকশিত নদীকে স্পষ্টভাবে চিহ্নিত করা যায় না। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এগুলি উত্তর ও পশ্চিম ভারতের উচ্চভূমি হতে উত্থিত হয়েছে। এদের গতিপথে এরা নানা রাজ্য, অঞ্চল ও জনপদ অতিক্রম করে বাঙলায় প্রবেশ লাভের মাধ্যমে বাঙলার নদী নামে সম্বোধিত হয়েছে। এর সঙ্গেও মনে রাখতে হবে যে যুগ ও কালের এবং রাজনৈতিক ঐতিহাসিক পট পরিবর্তনের ফলে এই নদীসমূহের বঙ্গদেশে প্রবেশ স্থলগুলির পরিচিতি পরিবর্তিত হয়েছে। যেমন নিকট ঐতিহাসিক যুগেও গঙ্গানদীর বঙ্গদেশে প্রবেশ স্থল ছিল রাজমহল অঞ্চল কারণ সেই সময় বাঙলার সীমানা ঐ পর্যন্তই বর্ধিত ছিল। তবে কিছু নদী রয়েছে যেগুলি হিমালয় অঞ্চল থেকে উত্থিত হয়ে দক্ষিণে প্রবেশ করেছে। যাইহোক আমাদের যে আলোচ্য বিষয় যেমন সাংস্কৃতি-সভ্যতার বিকাশে বঙ্গের নদ-নদীর ভূমিকা সে সম্পর্কে আলোকপাত করতে হলে প্রাগৈতিহাসিক যুগের গতি-প্রকৃতির উপর নজর দান আবশ্যিক। বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিমাঞ্চলের পাহাড়ী নদীগুলির তীরভূমি জুড়ে যে প্রাগৈতিহাসিক সংস্কৃতির বিকাশ ঘটেছিল তার কিছু স্পষ্ট হদিশ মুষ্টিমেয় প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখনন এবং আকস্মিক পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে পাওয়া গিয়েছে। এ বিষয়ে দামোদর নদীর নাম সর্বপ্রথমে উল্লেখযোগ্য। ঝাড়খণ্ডের পালামৌ জেলার চান্দোয়ার নিকট একটি পাহাড়ী এলাকায় উদ্ভূত হয়ে দক্ষিণ-পূর্ব মুখে এই নদী প্রবাহিত হয়েছে। এই নদীর প্রবাহ ছোটনাগপুর মালভূমির টিলা ও অরণ্য সমন্বিত অঞ্চলে নানা ধরনের নয়ন মনোহর দৃশ্যের অবতারণা করেছে — কোথাও জলপ্রপাত, কোথাও নদীপ্রপাত, আবার কোথাও অরণ্যরাজির অভ্যন্তরে লুকোচুরি। এই ছোটনাগপুর অঞ্চলটি প্রস্তর যুগের অ্যাচুলীয় ভূ-তাত্ত্বিক স্তরভুক্ত। এটিই হল সমগ্র বৃত্তের অঞ্চলটির সর্বাপেক্ষা কঠিন শিলারাশি। এখান থেকে শুরু করে দামোদর নদী কঠিন শিলারাশি কর্তন করে অগ্রসর হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিমাঞ্চল যেমন পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পশ্চিম মেদিনীপুর, বীরভূমের পশ্চিমাংশ এই ছোটনাগপুর মালভূমির ভূতাত্ত্বিক প্রভাবে প্রভাবিত। দামোদর নদী ছোটনাগপুর অঞ্চলের ঢাল জুড়ে যে উপত্যকা ভূমির সৃষ্টি করেছে সেটি দামোদর উপতকা (Damoder valley) নামে পরিচিত। দামোদর বর্তমান পশ্চিমবঙ্গে পুরুলিয়া জেলার মাধ্যমে প্রবেশ করেছে। সাঁওতালডির নিকট এর অনুপ্রবেশ ঘটেছে। তারপর এই নদী বর্তমানের সামান্য অংশ দিয়ে প্রবাহিত হয়ে বাঁকুড়ায় প্রবেশ করেছে। এমনিভাবে হুগলি

ও হাওড়া জেলায় প্রবাহিত হওয়ার পর হুগলি নদীতে মিলিত হয়েছে। দামোদরের উচ্চ প্রবাহে প্রাগৈতিহাসিক প্রস্তর শিল্পের বিশেষ নিদর্শন পাওয়া যায়। এখানে প্রত্নপ্রস্তর যুগের হাতকুঠার, কর্তরী, ছেদনি ইত্যাদির মতো হাতিয়ার পাওয়া গিয়েছে। আবার পরবর্তী প্রস্তর যুগ অর্থাৎ মধ্যপ্রস্তর যুগের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ক্ষুদ্রাস্ত্র (Microliths) প্রচুর পরিমাণে আবিষ্কৃত হয়েছে। এখানে লক্ষ্যণীয় বিষয় যে এই সুবিস্তীর্ণ। দামোদর উপত্যকায় যে সুপ্রাচীন প্রাগৈতিহাসিক প্রস্তর সংস্কৃতির উদ্ভব ঘটেছিল তা যুগ ও কালের সীমানাকে অতিক্রম করে নব্যপ্রস্তর যুগ এবং পরবর্তী ধাতুযুগের নানা নিদর্শন আমাদের উপহার দেয়। বর্তমানে দামোদর উপত্যকা ভূমিতে বসবাসকারী অসুর জনগোষ্ঠী লৌহশিল্প প্রবর্তন ও বিকাশের ক্ষেত্রে বিশেষ উদাহরণ। সাম্প্রতিককালে দামোদর উপত্যকা সংস্কৃতির রেশ অবিচ্ছিন্নভাবে বয়ে নিয়ে চলেছে এই অঞ্চলের আদিবাসী জনগোষ্ঠী। দামোদর নদী আদিবাসী মানুষদের নিকট অতি পবিত্র — অতীব মহিমময় দামোদরের এই উপস্থিতি। এদের সমাজধর্মীয় জীবনের সঙ্গে দামোদর বিশেষভাবে জড়িত। নানা আচার-অনুষ্ঠান, পূজা-উৎসবে দামোদরের পবিত্র জলরাশি এদের নিকট কাম্য. দামোদরের জলব্যতিত এদের বহু অনুষ্ঠান সম্পূর্ণ হয় না। তাই দামোদর আজও এই আদিবাসী জনগোষ্ঠীর সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক ধারার মধ্যে বিরাজমান। দামোদরের একই জলধারা যেমন পশ্চিমবঙ্গের বুকে প্রবহমান ঠিক তেমনি তার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যও গতিময়তা লাভ করেছে। প্রাগৈতিহাসিক যুগে দৃষ্টিপাত করলে খুব সহজেই প্রতিভাত হবে যে সেদিনের বঙ্গ ভূমিতে দামোদরের তীরভূমি জুড়ে প্রাচীনতম সংস্কৃতির বিকাশ ঘটেছিল। এই প্রসঙ্গে বর্ধমান জেলায় দামোদরের তীরবর্তী মধ্যপ্রস্তর যুগীয় সংস্কৃতি ক্ষেত্রটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। দামোদরের একটি প্রাচীন নদীবেদিকায় এই সংস্কৃতি ধারার বিকাশ ঘটে। এই ধারাটি মধ্যপ্রস্তরযুগীয় লক্ষণযুক্ত। ভারতীয় প্রত্নবিজ্ঞান সর্বেক্ষণের মহাপরিচালক বি. বি লালের নির্দেশে ১৯৫২ থেকে ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দে এখানে সুসমঞ্জস খনন কার্য সম্পাদিত হয়। এখানের ভূমিভাগে বালুকা প্রস্তরের প্রসারিত স্তর দেখা যায়। এর উপরিভাগে পলিগঠিত খনক্ষেপণ এবং ল্যাটেরাইট প্রভাবিত স্তর দেখা গিয়েছে। তার উপরে ক্ষুদ্রাস্ত্র নির্মাণকারী মানবগোষ্ঠীর বাসভূমির চিহ্ন দেখা যায়। অর্থাৎ এই মানুষেরা ছিল মধ্যপ্রস্তর যুগের অন্তর্ভুক্ত। এখানে এই যুগে নির্মিত কুটির সমূহের চিহ্নস্বরূপ খুঁটির গর্ত (Post holes) দেখা গিয়েছে। ক্ষুদ্রাস্ত্রগুলি স্ফটিক পাথর, চ্যালসেডনি এবং শিলীভূত কাঠের সাহায্যে তৈরি করা হয়েছে। বি. বি. লালের মতে সামগ্রিক ভারতীয় ক্ষুদ্রাস্ত্র নির্মাণ রীতিতে বীরাভানকুরের আয়ুধগুলি বিশিষ্টতার দাবি রাখে। এই বীরভানপুর ক্ষেত্রটিতে যে সকল ক্ষুদ্রায়ুধ আবিষ্কৃত হয়েছে তার মধ্যে ফলক আয়ুধ, অর্ধচন্দ্রাকৃতি আয়ুধ, তীক্ষ্ণাগ্র, চাঁছলি, বেধনী, ছেদনী ইত্যাদি প্রধান। বিভিন্ন উপাদান সমূহের বিজ্ঞানভিত্তিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে দেখা যায় যে বীরভানপুরের তদানীন্তন আবহাওয়ায় এখানে শালগাছের ঘন অরণ্য বিকাশলাভ করেছিল।

অজয় নদীও বহু প্রাচীন সংস্কৃতি ও সভ্যতার উন্মেষে মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। কয়েকটি প্রত্নতাত্ত্বিক সমীক্ষা এবং কিছু উপরিভাগ পর্যবেক্ষণের (Surface findings) মাধ্যমে অজয় তীরবর্তী এলাকায় প্রস্তর যুগের সংস্কৃতি থেকে শুরু করে লৌহযুগের সভ্যতার বিভিন্ন নিদর্শন মিলেছে। সেদিনের অতিশয় নাব্য অজয় একদিকে যেমন পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার অতীব প্রয়োজনীয় সুযোগ দান করেছিল তেমনি এর জলধারার জলজ প্রাণি সংগ্রহ এবং কৃষিকার্য পরিচালিত হত। ঝাড়খণ্ডের হাজারিবাগের নিকটবর্তী ঢাকাই পর্বত থেকে উত্থিত এই নদী চিত্তরঞ্জনের নিকট বর্ধমান জেলায় প্রবেশ করে পশ্চিম থেকে পূর্বে প্রবাহিত হয়ে বর্ধমান-বীরভূম জেলা দুটির সীমানা রচনা করেছে। বর্ধমান জেলায় কাঁকসা অরণ্যভূমির নিকট সাহকাহানিয়ায় কিছু প্রত্ন-প্রস্তর যুগের আয়ুধ সম্ভার মিলেছে। তবে এই অরণ্যভূমির অন্তর্গত বসকাটি এবং পাণ্ডুরাজার ঢিবিতে এই সময়ের বেশ কিছু খোদানাস্ত্রের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। পাণ্ডুরাজার ঢিবি অজয়ের দক্ষিণ তীরে অবস্থিত। অজয় তীরের সংস্কৃতি ও সভ্যতা বিকাশের একটি উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত হিসেবে পাণ্ডুরাজার ঢিবি উপস্থাপিত হয়েছে। প্রাগৈতিহাসিক-ঐতিহাসিক যুগ সন্ধিক্ষণের বহু বস্তুগত নিদর্শন এখানে আবিষ্কৃত হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের পরিচালনায় এখানে ১৯৫২ থেকে ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে কয়েকটি বিস্তৃত খনন কার্যসম্পন্ন হয়েছে এবং তার ফলে এখানে প্রাচীনতম সভ্যতার ধারার প্রতি আলোকপাত সম্ভব হয়েছে। একেবারে আদি প্রস্তর যুগের কিছু নিদর্শনসহ তাম্র ও লৌহযুগের নানা তথ্যে এই প্রাচীনতম সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রটি পরিপূর্ণ। এখানেই সর্বপ্রথম প্রাগৈতিহাসিক বাংলার মানব সংস্কৃতি ও সভ্যতার মোটামুটিভাবে সুসমঞ্জস চিত্র লক্ষিত হয়। এখানের উৎখনিত স্তরসমূহে বিভিন্ন প্রাচীনতম কুটিরের ধ্বংসাবশেষ, মানব সমাধি ও মৃৎপাত্র পাওয়া গিয়েছে। এর সঙ্গে বেশ কিছু ক্ষুদ্রাস্ত্রের সন্ধান মিলেছে। এর নিম্নস্তরগুলিতে কয়েক ধরনের প্রত্ন-প্রস্তর যুগের হাতিয়ার আবিষ্কৃত হয়েছে। উপরের স্তরগুলিকে বহু লাল-কালো মৃৎপাত্র দেখা গিয়েছে। কুমোরের চাকার সাহায্যে তৈরি করে এগুলি নিয়ন্ত্রিত তাপমাত্রায় আগুনে পোড়ান হত। এখানের বাসিন্দারা ছোট ছোট গৃহনির্মাণ করে বসবাস করত। এখানে আবিষ্কৃত খুঁটির গর্তগুলি পরীক্ষা করে প্রমাণিত হয়েছে যে এদের গোলাকার অথবা আয়তাকার ঘরগুলির দেওয়াল ছিল শক্ত ধরনের কাঁচামাটির সাহায্যে তৈরি, যাদের উপর পাতা অথবা খড়ের আচ্ছাদন ছিল। পাণ্ডুরাজার ঢিবির সভ্যতার পরিণত পর্যায়ে কিছু ধান এবং ধানের খোসার অস্তিত্ব মিলেছে। পরীক্ষার মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে যে এই ধান কৃষিজশ্রেণীভুক্ত। অতএব একথা মেনে নিতে কোনও দ্বিধা নেই যে পাণ্ডুরাজার ঢিবিতে বসবাসকারী মানুষেরা ধান চাষে অভ্যস্ত ছিল। এখানের তাম্রযুগ বিশেষভাবে উন্নত পর্যায়ের ছিল। নানা ধরনের মাটির পাত্রের সঙ্গে তাম্রপাত্রও নির্মিত হত। এখানের স্তরগুলিতে হাড়ের তৈরি আয়ুধ যেমন বর্শাফলক, তীক্ষ্ণাগ্র ছাড়াও ঘোরানো ছুরি, মাছ ধরার বঁড়শি এবং বেশ কিছু পুঁতি পাওয়া গিয়েছে। এখানে আবিষ্কৃত সম্ভার সমূহের

মধ্যে শিমূল তুলোর সরু সুতোর সাহায্যে বোনা বস্ত্রখণ্ডও রয়েছে। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের তাম্র-প্রস্তর যুগে বস্ত্রবয়ন শিল্পের নিদর্শন রয়েছে। কাজেই এই বিষয়টি নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে যে অজয় উপত্যকায় বিকশিত পাণ্ডুরাজার ঢিবি একটি উন্নত মানের প্রাচীন বঙ্গীয় সভ্যতার নিদর্শন উপস্থাপন করেছে।

এরই নিকটবর্তী অঞ্চলে ময়ূরাক্ষী উপত্যকা ময়ূরাক্ষী নদীর একটি ফলদায়ক অবদান। ঝাড়খণ্ডের দেওঘরের নিকটবর্তী ত্রিকূট পাহাড় থেকে উৎপন্ন হয়ে দুমকা জেলায় প্রবেশ লাভ করেছে যে নদীটি সেটি মোর নামে পরিচিত। এই জেলার সাঁওতাল পরগনা অঞ্চলে এই নদী আমজোড়ার নিকটবর্তী অংশে বাঙলায় প্রবেশ করেছে। এই অঞ্চলেই মোর নামটি পরিবর্তিত হয়ে ময়ূরাক্ষীতে পরিণত হয়েছে। ময়ূরাক্ষী গতিপথে আবিষ্কৃত হয়েছে কয়েকটি নদীবেদিকা যেখানে আদিম আদিম প্রাগৈতিহাসিক মানুষদের হস্তাকৃতি বিশেষভাবে নজরে পড়ে। তবে এই সকল ক্ষেত্রসমূহের বিজ্ঞানভিত্তিক সুসম্বন্ধ উৎখনন এবং বিভিন্ন ধরনের প্রাপ্ত আয়ুধগুলির ক্ষেত্রভিত্তিক মূল্যায়ন করা যায়নি। ময়ূরাক্ষী উপত্যকার সন্নিহিত অঞ্চলে বক্রেশ্বর নদী এবং এখান থেকে কিঞ্চিৎ দূরে কোপাই নদীর অববাহিকাগুলিতে আদিম মানুষদের কর্মকাণ্ডের বহু নিদর্শন মিলেছে। কোপাইয়ের তীরে মহিষদল একটি বিখ্যাত প্রত্নতাত্ত্বিক ক্ষেত্র যেটি ভারতীয় প্রত্নতাত্ত্বিক সর্বেক্ষণের অধীন উৎখনিত এবং মূল্যায়িত হয়েছে। মধ্যযুগীয় ক্ষুদ্রাস্ত্র, নব্যপ্রস্তর যুগের কুঠার ফলক, হাড়ের চিরুনী, তামার তৈরি তীরের ফলা এবং মাছ ধরার বঁড়শী পাওয়া গিয়েছে। এছাড়া ছিল বিভিন্ন ধরনের পোড়ামাটির পাত্র। কিছু পোড়া চালের নিদর্শনও মিলেছে। পরবর্তী পর্যায়ে লৌহ নির্মিত কিছু হাতিয়ার এবং তৈজসপত্র পাওয়া গিয়েছে।

পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার কংসাবতী উপত্যকা এবং সুবর্ণরেখার উপত্যকা ভূমিতে প্রাগৈতিহাসিক জনজীবনের উল্লেখযোগ্য নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে। প্রত্নপ্রস্তর, নব্যপ্রস্তর এবং তাম্রপ্রস্তর যুগের বিভিন্ন ধরনের হাতিয়ার যেমন হাতকুঠার, ছেদনী, কুঠার ফলক, বাটালি, ছুরি এবং ঐ সঙ্গে বহু ক্ষুদ্রাস্ত্র পাওয়া গিয়েছে। এই সকল নদীতীরবর্তী অঞ্চলে আদিমানবগোষ্ঠীর বাসভূমি গড়ে উঠেছিল। বাঁকুড়ার দ্বারকেশ্বর, শিলাবতী এবং গন্ধেশ্বরী নদীসমূহের তীরভূমি জুড়ে বহু প্রাগৈতিহাসিক জীবনধারা ভিত্তিক হাতিয়ারের নিদর্শনে ভরপুর। এই সকল নদীগুলির তীরভূমির উপরিভাগে আজও বহু এবং বিভিন্ন ধরনের প্রস্তরায়ুধ ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। সামান্য অনুসন্ধানেই এগুলির হদিশ মিলে যায়। এমনিভাবে বাঙলার পশ্চিমাংশে গণ্ডোয়ানা ভূমিরূপ প্রভাবিত অঞ্চলের নদীতীরবর্তী অঞ্চলগুলিতে সংস্কৃতির প্রাথমিক পর্যায় অর্থাৎ সভ্যতা আগমনের সূত্রপাত ঘটেছিল। এগুলিই পরবর্তী পর্যায়ে নদীতীরবর্তী সভ্যতা হিসেবে বিশেষভাবে পরিচিতি লাভ করে। বাঙলার গণ্ডোয়ানা ভূমিভাগের এই বিকশিত সভ্যতা পরবর্তী পর্যায়ে পলিগঠিত উত্তর-পূর্বাঞ্চলে সম্প্রসারিত হয় এবং তা পরিব্যাপ্তি পদ্ধতির (Diffusionistic method) মাধ্যমে প্রব্রজিত হয়েছে। এই পলি সমৃদ্ধ অঞ্চলগুলিতে কৃষিভিত্তিক কার্যাবলীর প্রভূত সম্ভাবনা

এবং ছোট বড় নদী সমষ্টির জালিকা সমন্বিত ভূমিভাগে মাছ এবং অন্যান্য জলজপ্রাণি সংগ্রহের অতীব সুবিধাজনক পরিস্থিতি থাকায় এই সব অঞ্চলে প্রচুর মানুষের প্রব্রজন ঘটতে থাকে ; এবং কালক্রমে এরাই এই বিশেষ ভূমিভাগগুলির স্থায়ী বাসিন্দায় পরিণত হয়। বাঙলার সুপ্রাচীন সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল এবং সুপ্রাচীন সভ্যতার চেতনা যে নদীকেন্দ্রিক এ বিষয়টি উল্লেখের অপেক্ষা রাখে না। তদানীন্তন বাঙলার সমৃদ্ধির রূপায়ক হল এই সকল নদীর সমষ্টি। এই সব নদীপথ ধরে বাঙলার ভাগ্যলক্ষ্মীর অনুপ্রবেশ ঘটেছে বললে অত্যুক্তি হয় না। সপ্তগ্রাম, তাম্রলিপ্ত প্রভৃতি আন্তর্জাতিক নদী-সমুদ্র বন্দর ছাড়াও বিভিন্ন নদীবক্ষে বহু বন্দর গড়ে উঠেছিল যেখান থেকে নানা ধরনের পণ্য দেশ-বিদেশে আমদানী-রপ্তানী হয়েছে। বাঙলার অর্থনৈতিক পশ্চাৎপটে যেমন নদীর বিশিষ্ট অবদান রয়েছে তেমনি নদীকেন্দ্রিক রাজনৈতিক বাতাবরণও সৃষ্টি হয়েছে। এই নদীবক্ষেই রণতরী ভেসেছে — এর উপরই নৌকা ভাসিয়ে বাঙলার মানুষ শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করেছে — মিত্রকে স্বাগত জানিয়েছে। নদীবক্ষে চলাচল এবং বিভিন্ন ধরনের নদীস্রোতের সঙ্গে সমঝোতা করার কৌশল বাঙলার মানুষ সুন্দরভাবে আয়ত্ত করেছিল। এই নদীপথ বেয়েই নানা ধর্মমতের আনাগোনা হয়েছে। বাঙলায় বিভিন্ন ধর্মমতের দ্বন্দ্ব-সংকট হয়েছে — আবার কখনও ঘটেছে ধর্ম সমন্বয়। নদী কখনও হয়ে উঠেছে ভয়ঙ্করী। দক্ষিণে সুদূর প্রসারিত বঙ্গভূমিতে সুন্দরবনের উপস্থিতি বৃষ্টি আনয়নকারী অন্যতম প্রধান নির্ধারক হিসেবে কাজ করেছে। উত্তর হিমালয় সংলগ্ন অঞ্চলের বৃষ্টিপাতও প্রচণ্ড গতি ও বিক্রমে দক্ষিণাভিমুখী হয়েছে। পশ্চিমের ছোটনাগপুর মালভূমির ঢালও এই বঙ্গদেশ অভিমুখী। ফলে এখানের নদীগুলিতে প্লাবন খুবই সাধারণ বিষয়। সেই প্লাবন মাত্রাতিরিক্ত হলে জনজীবনে নেমে আসে চরম বিপর্যয়। এর ফলে বারে বারে বাঙলার মানুষের জীবন বিপর্যস্ত হয়েছে। কিন্তু বাঙলার মানুষ সম্মিলিত শক্তিতে এবং অতুলনীয় মনোবলের ভিত্তিতে সেইসব বিপর্যয়কে প্রতিহত করে নতুন উদ্যমে কাজে মেতেছে। অস্বীকার করার উপায় নেই যে এই নদীমাতৃক বাসভূমিই তার হৃদয়ে সেই উদ্যমের সঞ্চার করেছে। নদীর করুণার দান স্নেহের প্রলেপ তার বন্যাবিধ্বস্ত জীবনে শান্তিবারি সিঞ্চন করেছে। এইসব কারণে নদীর প্রতি বাঙলার মানুষের ভক্তি এবং ভীতি — দুইই জেগেছে। এই ভক্তি ও ভীতির প্রকাশ থেকেই সৃষ্টি হয় নানা আচার-অনুষ্ঠান, পূজা-পার্বণ। কারণ দুটি প্রাকৃতিক ও আধিভৌতিক শক্তিসমূহকে নিয়ন্ত্রণ করার পশ্চাৎপটেই ধর্মানুষ্ঠানের প্রয়াস সৃষ্টি হয়েছিল। এই সকল বিশ্বাসধারাকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছিল নানা আচার, ব্রত-পার্বণ ও বিধি-নিষেধ। কাজেই নদীগুলিকে ঘিরেই সৃষ্টি হয়েছে বাঙলার নানা উৎসব ও অনুষ্ঠান। জলসম্পদকে কেন্দ্র করেই বাঙালীর জীবন রূপায়িত হয়েছে এবং সেই জীবন রক্ষায় জলসম্পদকে শ্রদ্ধা জানাতেই হবে। পালন করতে হবে নানা ব্রত ও বিধি-নিষেধ। এমনিভাবে বাঙলার মানুষের সঙ্গে, তার সামাজিক-সাংস্কৃতিক জীবনের সঙ্গে নদী একাত্ম হয়ে উঠেছে যার রেশ আজিও একই খাতে বয়ে চলেছে।

কিন্তু এই প্রসঙ্গে একথা স্বীকার করতেই হবে যে নদীকে কেন্দ্র করে নদীর জলসম্পদের কল্যাণে যে বাঙালী, যে মানুষের জীবন রূপময় হয়েছে সেই নদীসমূহের অধিকাংশই আজ চরম বিপর্যয়ের মুখে। প্রাকৃতিক কারণের সঙ্গেও রয়েছে বহু মানব সৃষ্ট কারণ যার জন্য নদীগুলি আজ বিধ্বস্ত, বিপর্যস্ত। সারা ভারত জুড়েই এই চিত্র চোখে পড়বে। বর্তমান পশ্চিমবঙ্গে এই নদীদূষণের দৃষ্টান্তের তো অভাব নেইই বরং বিশেষ ক্ষেত্রে চরমতম পর্যায়ে পৌঁছেচে। বাঙলার সভ্যতা নদীমাতৃক — নদীই জননীর স্নেহে বাঙলার মানুষকে লালন-পালন করেছে। সেই মাতৃরূপিণী নদীই আজ বিপর্যস্ত — অবমাননার শিকার। নদী ব্যতিত সভ্যতা অচল। একথা আমরা মানি। নদীই যদি লুপ্ত হয়ে যায় তাহলে মানব সভ্যতার কি হবে? সভ্যতাবিহীন মানুষের কি কোনও পরিচিতি থাকবে? কাজেই আজকে অন্যভাবে চিন্তা করার সময় এসেছে। মানুষকে সজাগ ও সচেতন হতে হবে। নদীকে বাঁচাতে হবে এবং আমাকেও বাঁচতে হবে। এর জন্য আক্ষরিক অর্থে কেবলমাত্র ফুল/ বেলপাতা দিয়ে নদীপূজা নয় — প্রায়োগিক পরিমণ্ডলে এই নদীপূজার রূপদান করা আবশ্যিক। প্রকৃতির সব কিছুই প্রাকৃতিক নিয়মে চলে। এই সকল নিয়ম সমূহ স্বয়ংক্রিয়। এই নিয়মের অঙ্গণে সব কিছু প্রয়োজনানুযায়ী নিঃশব্দে ঘটে চলে যদি না এর মধ্যে কোনও বিশৃঙ্খলা ঘটে যায় বা ঘটানো হয়। প্রকৃতির নিয়ম-শৃঙ্খলার বিরুদ্ধে কোনও কাজ করলে অর্থাৎ চলমান স্বাভাবিক পর্যায়টিকে বাধাদান করলে প্রকৃতি অচিরেই সেই বাধার প্রত্যাঘাত করবে। এটিই প্রকৃতির নিয়ম। কেবলমাত্র মানুষ ব্যতিত সব জীবই এই প্রাকৃতিক নিয়মের অনুকূলে চলে — এদের কার্যধারা সেইভাবেই পরিচালিত হয়। মানুষ তার উন্নত চিন্তাধারার মাধ্যমে প্রকৃতিকে নানাভাবে শাসন করতে উদ্যত হয়েছে — কখনও তার নিজস্ব স্বার্থে প্রকৃতি বিরুদ্ধ কাজকর্মে ব্রতী হয়েছে। জীবনচর্যায় ত্বরিত উন্নয়নের আশা নিয়ে প্রকৃতির বাস্তুতন্ত্রকে বিঘ্নিত করেছে। সেদিনের বঙ্গদেশে ব্রিটিশ রাজত্বের পরিমণ্ডলে অত্যন্ত উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঙ্গে সুন্দরবনের গভীর জঙ্গলের বিস্তৃত অংশ কৃষিজমি উদ্ধারের কাজে কেটে ফেলা হয়। সেদিনের প্রশাসন রাজস্ব বৃদ্ধির উদ্দেশ্যেই এই উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল। কিন্তু এতে কেবলমাত্র সমগ্র জঙ্গলের পরিবেশ নয়, এর সঙ্গে জড়িত নদী-নালা, খাড়ি, প্রণালী, জলজ এবং স্থলজ প্রাণি সকলের মধ্যে প্রচণ্ড আঘাত এসেছিল যার রেশ আজও চলেছে। সুন্দরবন অঞ্চলে ব্যাপক বৃক্ষচ্ছেদন নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা। এই যথেচ্ছ বৃক্ষচ্ছেদন নদীর পাড়গুলিকে অশক্ত করে দেয়। জোয়ার-ভাটার প্রভাবে নদীর তীরগুলিতে যে চাপ সৃষ্টি হয় তার ফলে আলগা মাটি ধুয়ে জলের মধ্যেই মিশে যায়। ক্রমাগত এই ধরনের ঘটনায় নদীর ভাঙন বেড়েই চলেছে। ফলে বন্যা পরিস্থিতিকে মোকাবিলা করার মতো কোনও কিছুই আর অবশিষ্ট নেই। এই কারণেই প্রতিবছরই বিশেষ বিশেষ সময়ে সুন্দরবন অঞ্চলের বাসিন্দাদের দুর্গতির সীমা থাকে না। সুন্দরবনের নদীগুলির মধ্যে যে ধরনের দুর্ঘটনা ঘটে চলেছে তা কিন্তু সার্বিকভাবে প্রাকৃতিক বাস্তুতন্ত্রের চরমতম বিশৃঙ্খলার ফল এবং সেই বিশৃঙ্খলার জন্য মানুষ প্রত্যক্ষ

এবং পরোক্ষভাবে দায়ী। কোনও এক অতি সুদূর অতীতে বঙ্গেরই মহান পুরুষ ভগীরথ তাঁর একনিষ্ঠ তপস্যা এবং সার্বিক একাগ্রতার সাহায্যে পবিত্র শঙ্খধ্বনির মাধ্যমে পতিত-পাবনী গঙ্গাকে পথ প্রদর্শন করে মর্তে আনয়ন করেছিলেন। এর ফলে বঙ্গদেশ এবং সংশ্লিষ্ট বহুবিস্তীর্ণ অঞ্চল ধনে-ধান্যে পরিপূর্ণ হয়ে উঠে। তাঁর জলরাশিতে তিনি অনুর্বর মাটিকে শস্য-শ্যামল করে তুলেছেন। এই আর্থিক সচ্ছলতায় মানব জীবন পরিপূর্ণ — জীবনে এসেছে পরম শান্তি। এই কারণেই গঙ্গার এই শান্তিবারি অতি পবিত্র। এই পবিত্রতা কোনদিন কলুষিত হয় না — পতিত উদ্ধার হয়ে যায় এই জলস্পর্শে। তাই গঙ্গা পতিতপাবনী। কিন্তু আজকের বাস্তব অন্যকথা বলে। এই গঙ্গার বর্তমান জলধারা এত মলিন ও দূষিত হয়ে পড়েছে যে এর জল ব্যবহার করাই আজ বিপদ্‌জনক। বঙ্গের ভাগীরথীকে তো আজ আর ভগীরথ নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন না বা সে প্রশ্নও উঠে না। মানুষেরই অপকর্ম আজ পতিতপাবনীকেই পতিত করে দিয়েছে। এ বড় দুঃখ ও পরিতাপের বিষয়।

অত্যন্ত সৌভাগের বিষয় যে হাজার হাজার মাইল পাহাড়-পর্বত, টিলা, মালভূমি, সমভূমি অতিক্রম করে এই গঙ্গা কিন্তু সাগরে বিলীন হয়েছে আমাদেরই এই বঙ্গদেশে। গঙ্গা ও সাগরের এই মিলনস্থান গঙ্গাসাগর সারা ভারতের মানুষের নিকট অতি পবিত্র তীর্থভূমি। আজও প্রতিবছর বিশেষ একদিনে লক্ষ লক্ষ ভারতীয় পুণ্যার্থী হাজির হন এই পবিত্র সঙ্গমস্থলে। সেই ঐতিহ্যধারা আজও সমানে চলেছে। কিন্তু বাস্তব ঘটনা প্রবাহ সেই ঐতিহ্য অনুসারী নয়। বর্তমানে গঙ্গা যে জলরাশি নিয়ে সমুদ্রের কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ছে তা অতীব কলুষতাপূর্ণ দূষিত জলরাশি। কাজেই এর সাহায্যে পাপ স্খালন হয় কিনা সেই প্রশ্নের কোনও উত্তর নেই — কোনও উত্তরের অপেক্ষাই করে না। গঙ্গার এই মাত্রাতিরিক্ত জলদূষণ নদী-সমুদ্র কেন্দ্রিক জীবনবৈচিত্র্য প্রচণ্ড আঘাত হেনেছে। এই সঙ্গম স্থলটি বহু জলজ প্রাণি বিশেষ করে মৎস্য গোষ্ঠীর নিকট অতীব প্রয়োজনীয়ই নয় — অপরিহার্য। বহু সামুদ্রিক প্রাণি প্রজননকালে গঙ্গার মিষ্টি জলে ডিম পাড়তে আসে। বর্তমানে গঙ্গার অতিরিক্ত দূষণযুক্ত জলে এই কাজে চরমভাবে ব্যাহত হচ্ছে। কাজেই সাম্প্রতিককালে একটি প্রাকৃতিক জৈবিক চক্রের বিকৃতি ঘটেছে যা একটি গভীর অর্থনৈতিক সঙ্কটের সৃষ্টি করেছে। লক্ষ্য করার বিষয় যে গঙ্গা ঊর্ধ্ব স্রোতধারাতেই নানা ধরনের দূষণজনিত কার্যকলাপ শুরু হয়েছে। এগুলি সবই মনুষ্যকৃত। গঙ্গার দু'পাশের শহর ও কলকারখানার সমস্ত বর্জ্য পদার্থ গঙ্গার মধ্যে ফেলে দেওয়ার প্রবণতা দীর্ঘদিনের। গঙ্গার জলরাশি সীমিত এবং তার উপর অসংখ্য তৈলচালিত জাহাজ ও অন্যান্য জলযান থেকে তাদের দেহ নিঃসৃত তেল এবং দূষিত বর্জ্য পদার্থ জলে মিশে যায়। গঙ্গার দুই তীরে অবস্থিত দেবমন্দিরের সীমা-পরিসীমা নেই। এগুলি হতে প্রতিদিন বিশাল পরিমাণ পূজার ফুল/বেলপাতা ইত্যাদি গঙ্গার জলে ভাসিয়ে দেওয়া হয়। এগুলি পচন ধরে খুব স্বাভাবিকভাবেই জলদূষণ করে। সারা বছর ধরেই চলে নানা দেবদেবীর প্রতিমা বিসর্জন।

এগুলির রাসায়নিক রং এবং অন্যান্য বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থ জলে মিশে যায়। এছাড়াও রয়েছে প্লাস্টিক ও পলিথিন জাতীয় দ্রব্যসমূহের প্রতিক্রিয়া। এগুলি বহুল পরিমাণে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে গঙ্গার জলে পড়ছে। গঙ্গার সর্বাধিক দূষণ বোধ হয় এই পশ্চিবঙ্গেই। দীর্ঘকাল ধরে এই নদীর দুই তীরে পাট শিল্প কারখানা এবং বস্ত্রবয়ন কারখানাগুলির সমস্ত বর্জ্য পদার্থ, বহু রাসায়নিক শিল্পসংস্থার রাসায়নিক বর্জ্য পদার্থ, সমস্ত নর্দমার জলরাশি গঙ্গার বুকে অপ্রতিহত গতিতে পড়ে চলেছে। কলকাতার অধিকাংশ নর্দমার জল সোজাসুজি গঙ্গায় ফেলে দেওয়ার রেওয়াজ দীর্ঘদিনের। এদিকে প্রাকৃতিক নিয়মে গঙ্গার বুকে পলি জমে যাওয়ার জন্য গঙ্গার গভীরতা কমেছে এবং খুব স্বাভাবিকভাবেই এর নিম্নপ্রবাহে স্রোতধারার গতি স্তিমিত হয়ে পড়েছে। ফলে দূষণের মাত্রাও ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

এমতাবস্থায় অর্থাৎ উপরোক্ত সঙ্কটময় পরিস্থিতিতে নদী সম্পর্কে কোনও ধরনের আলোচনা করতে গেলে কেবলমাত্র ভাবপ্রবণতার উপর নির্ভর করে এর মূল্যায়ন করলে উদ্দেশ্য ব্যাহত হবে। এই পরিপ্রেক্ষিতে একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ বাস্তবায়িক এবং প্রয়োগিক দিকটিও তুলে ধরতে হবে। ভারতীয় ঐতিহ্যে নদী একটি মহিমময় প্রকাশ। মানুষের সামগ্রিক জীবনে নদী প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে যুক্ত। আর্থ-সামাজিক চিন্তাধারা এবং ধর্মীয় চেতনার বহুলাংশই নদীকেন্দ্রিক। সেই নদীকে অবহেলা এবং অনাদরের হাত থেকে রক্ষা করার প্রয়োজনীয়তা আজ অতীব তাৎপর্যপূর্ণ। নদী প্রত্যক্ষভাবে একটি প্রাকৃতিক অবদান এবং সেই অবদানটি মানুষের জীবনে সুখে এবং দুঃখে — এত বেশি জড়িত হয়ে পড়েছে যে নানাধরনের ধর্মীয় চিন্তাধারার মোড়কে একে সংবদ্ধ করা হয়েছে। একে কেন্দ্র করেই সৃষ্টি হয়েছে অসংখ্য লোকগাথা ও লৌকিক আচার-অনুষ্ঠান, বিশ্বাস ও সংস্কার। এই ধরনের একটি প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক সম্পদ যখন নানা ধরনের দূষণ এবং সংশ্লিষ্ট বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয় তখন নিশ্চেষ্ট হয়ে আক্ষরিকভাবে নদীপূজা করলে চলবেনা বা নদীর গান গাইলেও অবস্থান্তর ঘটবে না। নদীকে বাঁচাবার মহামন্ত্রে মানুষকে দীক্ষিত করতে হবে। অবশ্য একথা ঠিক যে সাম্প্রতিককালে নদীগুলিকে দূষণমুক্ত করতে এবং এগুলির স্বাভাবিক গতি রক্ষার উদ্দেশ্যে সরকারী পর্যায়ে কিছু প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। নদীর জলদূষণ রোধে নানা ধরনের আইন-কানুনও রচিত ও প্রযুক্ত হয়েছে। কিন্তু সমস্যার বিশালতার নিকট এগুলি বোধ কিছুই নয়। এতে আশানুরূপ ফল এখনও পাওয়া যায়নি। প্রতিটি মানুষকে এবিষয়ে প্রকৃতভাবে সচেতন করার আজ প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এ সম্পর্কে সাধারণ মানুষের শুভবুদ্ধি জাগ্রত করার প্রয়োজনীয়তা আজ প্রতিটি মুহূর্তে অনুভূত হচ্ছে।